কিন্নর দল

(গল্পগ্রন্থ – কিন্নর দল)

পাড়ায় ছ'সাত ঘর ব্রাহ্মণের বাস মোট। সকলের অবস্থাই খারাপ। পরস্পরকে ঠকিয়ে পরস্পরের কাছে ধার-ধোর করে এরা দিন গুজরান করে। অবিশ্যি কেউ কাউকে খুব ঠকাতে পারে না, কারণ সবাই বেশ হুঁশিয়ার। গরিব বলেই এরা বেশী কুচুটে ও হিংসুক, কেউ কারো ভাল দেখতে পারে না, বা কেউ কাউকে বিশ্বাসও করে না।

পূর্বেই বলেচি, সকলের অবস্থা খারাপ এবং খানিকটা তার দরুন, খানিকটা অন্য কারণে সকলের চেহারা খারাপ। কিশোরী মেয়েদেরও তেমন লালিত্য নেই মুখে, ছোট ছোট ছেলেরা এমন অপরিষ্কার অপরিচ্ছন্ন থাকে এবং এমন পাকা পাকা কথা বলে যে তাদের আর শিশু বা বালক বলে মনে হয় না। কাব্যে বা উপন্যাসে যে শৈশবকালের কতই প্রশস্তি পাঠ করা যায়, মনে হয় যে সব এদের জন্যে নয়, এরা মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হয়ে একেবারে প্রবীণত্বে পা দিয়েছে।

পাড়ায় একঘর গৃহস্থ আছে, তারা এখানে থাকে না, তাদের কোঠাবাড়িটা চাবি দেওয়া পড়ে আছে আজ দশ-বারো বছর। এদের মস্তবড় সংসার ছিল, এখন প্রায় সবাই মরে হেজে গিয়ে প্রায় পাঁচটি প্রাণীতে দাঁড়িয়েচে। বাড়ির বড় ছেলে পশ্চিমে চাকরি করে, মেজ ছেলে কলেজে পড়ে কলকাতায়, ছোট ছেলেটি জন্মাবধি কালা ও বোবা—পিসিমার কাছে থেকে মূকবধির বিদ্যালয়ে পড়ে। বড় ছেলে বিবাহ করেনি, যদিও তার বয়স ত্রিশ-বত্রিশ হয়েছে, সে নাকি বিবাহের বিরোধী, শোনা যাচ্ছে সে এমনি ভাবেই জীবন কাটাবে।

পাড়ার মধ্যে এরাই শিক্ষিত ও সচ্ছল অবস্থার মানুষ। সেজন্যে এদের কেউ ভাল চোখে দেখে না, মনে মনে সকলেই এদের হিংসা করে এবং বড় ছেলে যে বিয়ে করবে না বলছে, সে সংবাদে পাড়ার সবাই পরম সন্তুষ্ট। যখন সবাই ছোট ও গরিব, তখন একঘর লোক কেন এত বাড় বাড়বে? বড় ছেলে বিয়ে করলেই ছেলেমেয়ে হয়ে জাজ্বল্যমান সংসার হবে দু'দিন পরে, সে কেউ সহ্য করতে পারবে না। মেজ ছেলে মোটে কলেজে পড়ছে, এখন সাপ হয় কি ব্যাঙ হয় তার কিছু ঠিক নেই, তার বিষয়ে দুশ্চিন্তার এখনও কারণ ঘটেনি, তার বয়সও বেশী নয়।

মজুমদার-বাড়িতে ভাঙা রোয়াকে দুপুরে পাড়ার মেয়েদের মেয়ে-গজালি হয়। তাতে রায়—গিন্নী, মুখুজ্যে-গিন্নী, চক্কত্তি-গিন্নী প্রভৃতি তো থাকেনই, পাড়ার অল্পবয়সী বৌয়েরা ও মেয়েরাও থাকে। সাধারণত যেসব ধরনের চর্চা এ মজলিশে হয়ে থাকে, তা শুনলে নারীজাতি সম্বন্ধে লিখিত নানা সরল প্রশংসাপূর্ণ বর্ণনার সত্যতার সম্বন্ধে ঘোর সন্দেহযাঁর উপস্থিত নাহবে, তিনি নিঃসন্দেহে একজন খুব বড় ধরনের অপ্‌টিমিস্ট্‌।

আজ দুপুরে যে বৈঠক বসেছে, তাতে আলোচিত বিষয়গুলি থেকে মোটামুটি প্রতিদিনের আলোচনা ও বিতর্কের প্রকৃতি অনুমান করা যেতে পারে।

বোস-গিন্নী বলছিলেন—আর বাপু দিচ্ছি তো রোজই, আমার গাছের কাঁটাল খেয়েই তো মানুষ, আমাদের যখন কাঁটাল পাড়ানো হয়, ছেলেমেয়েগুলো হ্যাংলার মত তলায় দাঁড়িয়ে থাকে—ঘেয়ো কি ভুয়ো এক-আধখানা যদি থাকে তো বলি, যা নিয়ে যা। তোদের নেই, যা খেগে যা। তা কি পোড়ারমুখে কোনদিন সুবাক্যি আছে? ওমা, আজ আমার মেয়ে দুটো নেবুতুলতে গিয়েছে ডোবার ধারের গাছে, তো বলে কিনা রোজ রোজ নেবু তুলতে আসে, যেন সরকারি গাছ পড়ে রয়েছে আর কি—চব্বিশ ঝুড়ি কথা শুনিয়ে দিলে মন্টুর মা। আচ্ছা বলো তো তোমরাই—

মন্টুর মা—যাঁকে উদ্দেশ করে একথা বলা হচ্ছিল, তিনি এঁদের মজলিশে কেবল আজই অনুপস্থিত আছেন, নইলে রোজই এসে থাকেন। তাঁর অনুপস্থিতির সুযোগ গ্রহণ করে সবাই তাঁর চালচলন, ধরন-ধারন, রীতি-নীতির নানারূপ সমালোচনা করলে।

প্রিয় মুখুয্যের মেয়ে শান্তি—ষোল-সতেরো বছরের কুমারী—তার মায়ের বয়সী মন্টুর মা'র সম্বন্ধে অমনি বলে বসলো,—ওঃ, সে কথা আর বোলো না খুড়ীমা, কি ব্যাপক মেয়েমানুষ ঐ মন্টুর মা! ঢের ঢের মেয়েমানুষ দেখিচি, অমন লঙ্কাপোড়া ব্যাপক যদি কোথাও দেখে থাকি, ক্ষুরে ক্ষুরে নমস্কার, বাবা বাবা!

ছোট মেয়ের ঐ জ্যাঠামি কথার জন্যে তাকে কেউ বকলে না বা শাসন করলে না, বরং কথাটা সকলেই উপভোগ করলে।

তারপর কথাটার স্রোত আরও কতদূর গড়াতো বলা যায় না, এমন সময় রায়-বাড়ির বড়বৌ হঠাৎ মনে-পড়ার-ভঙ্গীতে বল্লেন—হাঁ, একটা মজার কথা শোনেনি বুঝি, শ্রীপতি যে বিয়ে করেচে, বটঠাকুরের কাছে চিঠি এসেচে, শ্রীপতির মামা লিখেচে।

সকলে সমস্বরে বলে উঠলো—শ্রীপতি বিয়ে করেচে!

তারপর সকলেই একসঙ্গে নানারূপ প্রশ্ন করতে লাগলো :

—কোথায়, কোথায় ?

—কবে চিঠি এল?

—তবে যে শুনলাম শ্রীপতি বিয়ে করবে না বলেচে!

শ্রীপতির বিয়ের খবরে অনেকেই যেন একটু দমে গেল। খবরটা তেমন শুভ নয়। কারো উন্নতির সংবাদ এদের পক্ষে আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করা অসম্ভব! তাদের যখন উন্নতি হল না, তখন অপরের উন্নতি হবে কেন? কিন্তু এর পরেই যখন রায়-বৌ মুখ টিপে হেসে আস্তে আস্তে বল্লেন—বৌটি নাকি বামুনের মেয়ে নয়—তখন সকলে খাড়া হয়ে সটান উঠে বসলো, তাদের মন-মরা-ভাবটা এক মুহূর্তে গেল কেটে। একটা বেশ সরস ও মুখরোচক পরনিন্দা আর ঘোঁটের আভাস ওরা পেলে, রায়-বৌয়ের চাপা ঠোঁটের হাসি থেকে।

শান্তি উৎসুক চোখে চেয়ে হাসিমুখে বল্লে—ভেতরে তাহলে অনেকখানি কথা আছে!

বোস-গিন্নী বল্লেন—তাই বল! নইলে এম্‌নি কোথাও কিছু নয় শ্রীপতি বিয়ে করলে, এ কি কখনো হয়! কি জাত মেয়েটার ? হিঁদু তো?

অর্থাৎ তাহলে রগড়টা আরও জমে।

রায়-বৌ বল্লেন—হিঁদুই, মেয়েটা বদ্দি বামুন।

এদেশে বৈদ্যকে বলে থাকে 'বদ্দি বামুন'–এ অঞ্চলের ত্রিসীমানায় বৈদ্যের বাস না থাকায় বৈদ্যজাতির সমাজতত্ত্ব সম্বন্ধে এদের ধারণা অত্যন্ত অস্পষ্ট। কারো বিশ্বাস ব্রাহ্মণের পরেই বৈদ্যের সামাজিক স্থান, তারা একপ্রকারের নিম্নবর্ণের ব্রাহ্মণ, তার চেয়ে নীচু নয়— আবার কারো বিশ্বাস তাদের স্থান সমাজের নিম্নতর ধাপের দিকে।

শান্তি বল্লে—বৌয়ের বয়েস কত?

—ওঃ, তা অনেক। শুনচি চব্বিশ-পঁচিশ—

সকলে সমস্বরে আবার একটা বিস্ময়ের রোল তুল্লে। চব্বিশ-পঁচিশ বছর পর্যন্ত মেয়ে আইবুড়ো থাকে ঘরে! এ আবার কোথাকার ছোট জাত, রামোঃ! ছিঃ—

শান্তির মা বল্লেন—তাহলে মেয়ে আর নয়, মাগী বল! পাঁড় শসা—বাপ-মা বুঝি ঘরে বীজ রেখেছিল?

কে একজন মুখ-টিপে হেসে বল্লেন—বিধবা না তো?

চক্কত্তি-গিন্নী বল্লেন—আগের পক্ষের ছেলেমেয়ে কিছু আছে নাকি মাগীর?

এ কথায় শান্তিই আগে মুখে আঁচল দিয়ে খিল্‌খিল্ করে হেসে উঠলো—তারপরে বাকি সকলে তার সঙ্গে যোগ দিলে। হ্যাঁ, এটা একটা নতুন ও ভারী মজার খবর বটে! মেয়ে-গজালির কিছুদিনের মত খোরাক সংগ্রহ হল। আমচুরি কাঁটালচুরির গল্প একটু একঘেয়ে হয়ে পড়েছিল।

ঠিক পরের দিনই এক অপ্রত্যাশিত ব্যাপার ঘটলো।শ্রীপতির মেজ ভাই উমাপতি গাঁয়ে এসে বাড়ির চাবি খুলে লোক লাগিয়ে ঘরদোর পরিষ্কার করাতে লাগলো।তার দাদা বৌদিদিকে নিয়ে শীগ্‌গির আসবে এবং কিছুদিন নাকি গাঁয়েই বাস করবে। বৌদিদি পাড়াগাঁ কখনো দেখেননি,—গ্রামে আসবার তাঁর খুব আগ্রহ। তার দাদাও কলকাতা বদলি হবার চেষ্টা করচে।

মেয়ে-মজলিশে সবাই তো অবাক। শ্রীপতি কোন্ মুখে অজাতের বউ নিয়ে গাঁয়ে এসে উঠবে! মানুষের একটা লজ্জা-সরমও তো থাকে, করেই ফেলেছিস্ না হয় একটা অকাজ! এ সব কি খিরিস্টানি কাণ্ডকারখানা, কালে কালে হল কি! আর সে ধিঙ্গি মাগীটারই বা কি ভরসা, ব্রাহ্মণদের মধ্যে ব্রাহ্মণপাড়ায় বিয়ের বউ সেজে সে কোন্ সাহসে আসবে!

শ্রীপতি অবিশ্যি বৌ নিয়ে পৈতৃক বাড়িতে আসার বিষয়ে এঁদের মত জিজ্ঞাসা করেনি। একদিন একখানা নৌকো এসে গ্রামের ঘাটে দুপুরের সময় লাগলো এবং নৌকো থেকে নামল শ্রীপতি, তার নববিবাহিতা বধূ, একটি ছোক্‌রা চাকর ও দুটি ট্রাঙ্ক ও একটা বড় বিছানার মোট, একটা ঝুড়ি-বোঝাই টুকিটাকি জিনিস। ঘাটে দু-একজন যারা অত বেলায় স্নান করছিল, তারা তখুনি পাড়ার মধ্যে গিয়ে খবরটা সবাইকে বললে। তখন কিন্তু কেউ এল না, অত বেলায় এখন শ্রীপতিদের বাড়ি গেলে তাদের খেতে বলতে হয়। অসময়ে এখন এসে তারা রান্নাবান্না চড়িয়ে খাবে, সেটা প্রতিবেশী হয়ে হতে দেওয়া কর্তব্য নয়, সুতরাং সে ঝঞ্ঝাট ঘাড়ে করবার চেয়ে এখন না যাওয়াই বুদ্ধির কাজ।

কিন্তু রাসু চক্কত্তি আর প্রিয় মুখুজ্যের বাড়ির মেয়েরা অত সহজে রেহাই পেলেন না। শ্রীপতি নিজে গিয়ে একেবারে অন্তঃপুরের মধ্যে ঢুকে বল্লে—ও পিসিমা, ও বৌদিদি, আপনারা আপনাদের বৌকে হাতে ধরে ঘরে না তুললে কে আর তুলবে! আসুন সবাই।

বাধ্য হয়ে কাছাকাছির দু-তিন বাড়ির মেয়েরা শাঁক হাতে, জলের ঘটি হাতে নতুন বৌকে ঘরে তুলতে এলেন—খানিকটা চক্ষুলজ্জায়, খানিকটা কৌতূহলে। মজা দেখবার প্রবৃত্তি সকলের মধ্যেই আছে। ছোটবড় ছেলেমেয়েও এল অনেক—শান্তি এল, কমলা এল, সারদা এল।

শ্রীপতিদের বাড়ির উঠোনে লিচুতলায় একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে, দূর থেকে মেয়েটির ধপ্‌ধপে ফর্সা গায়ের রং ও পরনের দামী সিল্কের শাড়ি দেখে সকলে অবাক হয়ে গেল। সামনে এসে আরও বিস্মিত হবার কারণ ওদের ঘটলো—মেয়েটির অনিন্দ্যসুন্দর মুখশ্রী দেখে। কি ডাগর ডাগর চোখ! কি সুকুমার লাবণ্য সারা অঙ্গে! সর্বোপরি মুখশ্রী—অমন ধরনের সুন্দর মুখ এসব পাড়াগাঁয়ে কেউ কখনো দেখেনি!

সকলে আশা করেছিল গিয়ে দেখবে, কালোকোলো একটা মোটা-মত মাগী আধ-ঘোমটা দিয়ে উঠোনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে প্যাট্-প্যাট্ করে চেয়ে রয়েছে ওদের দিকে। কিন্তু তার পরিবর্তে দেখলে, এক নম্রমুখী সুন্দরী তরুণী মূর্তি....। মুখখানি এত সুকুমার যে মনে হয় ষোল-সতেরো বছরের বালিকা।

বিকেলে ওপাড়ার নিতাই মুখুয্যের বৌ ঘাটের পথে চক্কোত্তি-গিন্নীকে জিজ্ঞেস করলেন— কি দিদি, শ্রীপতির বৌ দেখলে নাকি? কেমন দেখতে?

চক্কত্তি-গিন্নী বল্লেন—না, দেখতে বেশ ভালই—

চক্কত্তি-গিন্নীর সঙ্গে শান্তি ছিল, সে হাজার হোক ছেলেমানুষ, ভাল লাগলে পরের প্রশংসার বেলায় সে এখনও কার্পণ্য করতে শেখেনি, সে উচ্ছ্বসিত সুরে বলে উঠলো—চমৎকার, খুড়ীমা একবার গিয়ে দেখে আসবেন, সত্যিই অদ্ভুত ধরনের ভাল।

নিতাই মুখুজ্যের বৌ পরের এতখানি প্রশংসা শুনতে অভ্যস্ত ছিলেন না—বুঝতে পারলেন না শান্তি কথাটা ব্যঙ্গের সুরে বলছে, না সত্যিই বলছে। বললেন—কি রকম ভাল?

এবার চক্কত্তি-গিন্নী নিজেই বল্লেন—না, বৌ যা ভেবেছিলাম তা নয়। বৌটি সত্যিই দেখতে ভাল। আর কেনই বা হবে না বলো, শহরের মেয়ে, দিনরাত সাবান ঘষছে, পাউডার ঘষছে, তোমার-আমার মত রাঁধতে হত, বাসন মাজতে হত তো দেখতাম চেহারার কত জলুস বজায় রাখে।

এই বয়সে তো দূরের কথা, তার বিগত যৌবনদিনেও অজস্র পাউডার সাবান ঘষলেও যে কখনো তিনি শ্রীপতির বৌয়ের পায়ের নখের কাছে দাঁড়াতে পারতেন না—চক্কত্তি-গিন্নীর সম্বন্ধে শান্তির একথা মনে হল। কিন্তু চুপ করে রইল সে।

বিকেলে এ-পাড়ার ও-পাড়ার মেয়েরা দলে দলে বৌ দেখতে এল।অনেকেই বল্লে, এমন রূপসী মেয়ে তারা কখনো দেখেনি। কেবল হরিচরণ রায়ের স্ত্রী বল্লেন—আর বছর তারকেশ্বরে যাবার সময় ব্যান্ডেল স্টেশনে তিনি একটি বৌ দেখেছিলেন, সেটি এর চেয়েও রূপসী।

মেয়ে-মজলিশে পরদিন আলোচনার একমাত্র বিষয় দাঁড়ালো শ্রীপতির বৌ। দেখা গেল তার রূপ সম্বন্ধে দু-মত নেই সভ্যদের মধ্যে, কিন্তু তার চরিত্র সম্বন্ধে নানারকম মন্তব্য অবাধে চলেছে।

—ধরন-ধারন যেন কেমন-কেমন—অত সাজগোজ কেন রে বাপু?

—ভাল ঘরের মেয়ে নয়। দেখলেই বোঝা যায়—

—বাসন মাজতে হলে ও-হাত আর বেশীদিন অত সাদাও থাকবে না, নরমও থাকবে না—ঠ্যালা বুঝবেন পাড়াগাঁয়ের! গলায় নেক্‌লেস ঝুলুতে আমরাও জানি—

—বেশ একটু ঠ্যাকারে। পাড়াগাঁয়ের মাটিতে যেন গুমরে পা পড়ছে না, এমনি ভাব। বামুনের ঘরে বিয়ে হয়ে ভাবছে যেন কি—

—তা তো হবেই, বদ্দি বামুনের মেয়ে, বামুনের ঘরে এয়েচে, ওর সাতপুরুষের সৌভাগ্যি না?

নববধূর স্বপক্ষে বল্লে কেবল শান্তি ও কমলা। শান্তি ঝাঁজের সঙ্গে বললে—তোমরা কারো ভালো দেখতে পার না বাপু! কেন ওসব বলবে একজন ভদ্রঘরের মেয়ের সম্বন্ধে ? কাল বিকেলে আমি গিয়ে কতক্ষণ ছিলাম নতুন বৌয়ের কাছে। কোন ঠ্যাকার নেই, অংখার নেই, চমৎকার মেয়ে।

—কমলা বল্লে—আমাদের উঠতে দেয় না কিছুতেই—কত গল্প করলে, খাবার খেতে দিলে, চা করলে—আর খুব সাজগোজ কি করে! সাদাসিদে শাড়ি সেমিজ পরে তো ছিল। তবে খুব ফর্সা কাপড়চোপড়—ময়লা একেবারে দু'চোখে দেখতে পারে না—

শান্তি বল্লে—ঘরগুলো এরই মধ্যে কি চমৎকার সাজিয়েছে! আয়না, পিক্‌চার, দোপাটি ফুলের তোড়া বেঁধে ফুলদানিতে রেখে দিয়েছে—শ্রীপতিদা'রা বাপের জন্মে কখনো অমন সাজানো ঘরদোর বাস করেনি—ভারী ফিট্‌ফাট গোছালো বৌটি—

দিন-দুই পরে ডোবার ঘাটে নববধূকে একরাশ বাসন নিয়ে নামতে দেখে সকলে অবাক হয়ে গেল। চারিদিকে বনে ঘেরা ঝুপসি আধ-অন্ধকার ডোবাটা যেন মেয়েটির স্নিগ্ধ রূপের প্রভায় এক মুহূর্তে আলো হয়ে উঠল, একথা যারা তখন ডোবার অন্যান্য ঘাটে ছিল, সবাই মনে মনে স্বীকার করলে। দৃশ্যটাও যেন অভিনব ঠেক্‌লো সকলের কাছে, এমন একটা পচা এঁদো জঙ্গলে ভরা পাড়াগাঁয়ে ডোবার ঘাটে সাধারণত কালোকোলো, আধ-ময়লা শাড়িপরা শ্রীহীনা ঝি-বৌ বা ত্রিকালোত্তীর্ণা প্রৌঢ়া বিধবাদের গামছা-পরিহিতা মূর্তিই দেখা যায় বা দেখার আশা করা যায়—সেখানে এমন একটি আধুনিক ছাঁদের খোঁপাবাঁধা, ফর্সা শাড়ি-ব্লাউজপরা, রূপকথার রাজকুমারীর মত রূপসী, নবযৌবনা বধূ সজনেতলার ঘাটে বসে ছাই দিয়ে নিটোল সুগৌর হাতে বাসন মাজছে, এ দৃশ্যটা খাপ খায় না। সকলের কাছেই এটা খাপছাড়া বলে মনে হল। প্রৌঢ়ারাও ভেবে দেখলেন, গত বিশ-ত্রিশ বছরের মধ্যে এমন ঘটনা ঘটেনি এই ক্ষুদ্র ডোবার ইতিহাসে।

রায়পাড়ার একটি প্রৌঢ়া বল্লেন—আহা, বৌ তো নয়, যেন পিরতিমে—কিন্তু অত রূপ নিয়ে কি ডোবায় নামে বাসন মাজতে! না ও-হাতে কখনো ছাই দিয়ে বাসন মাজা অভ্যেস আছে! হাত দেখেই বুঝেছি।

তারপর থেকে দেখা গেল ঘরসংসারের যা কিছু কাজ শ্রীপতির বৌ সব নিজের হাতে করচে।

ইতিমধ্যে শ্রীপতির কলকাতায় বদ্‌লি হবার খবর আসতে সে চলে গেল বাড়ি থেকে।

পাড়ার মেয়েদের মধ্যে শান্তি ও কমলা শ্রীপতির বৌয়ের বড় ন্যাওটা হয়ে পড়লো।সকাল নেই বিকেল নেই, সব সময়েই দেখা যায় শান্তি ও কমলা বসে আছে ওখানে।

পাড়াগাঁয়ের গরিব ঘরের মেয়ে, অমন আদর করে কেউ কখনো রোজ রোজ ওদের লুচি—হালুয়া খেতে দেয়নি।

একদিন কমলা বল্লে—বৌদিদি, তোমার ঘরে কাপড়-মোড়া ওটা কি?

শ্রীপতির বৌ বল্লে—ওটা এস্‌রাজ—

—বাজাতে জানো বৌদি?

—একটুখানি অমনি জানি ভাই, কিন্তু অ্যাদ্দিন ওকে বার পর্যন্ত করিনি কেন জানো, গাঁয়ে-ঘরে কে কি হয়তো মনে করবে!

শান্তি বল্লে—নিজের বাড়ি বসে বাজাবে, কে কি মনে করবে?একটু বাজিয়ে শোনাও না বৌদি?

একটু পরে রায়-গিন্নী ঘাটে যাবার পথে শুনতে পেলেন শ্রীপতির বাড়ির মধ্যে কে বেহালানাকি বাজাচ্ছে। চমৎকার মিষ্টি! কোনো ভিখিরী গান গাচ্ছে বুঝি? দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণ শুনে তিনি ঘাটে চলে গেলেন।

ঘাটে গিয়ে তিনি মজুমদার-বৌকে বল্লেন কথাটা।

—ওই শ্রীপতির বাড়ি কে একজন বোষ্টম এসে বেহালা বাজাচ্ছে শুনে এলাম। কি চমৎকার বাজাচ্ছে দিদি, দু'দণ্ড দাঁড়িয়ে শুনতে ইচ্ছে করে!

দুপুরের মেয়ে-মজলিশে শান্তির মা বল্লেন—শ্রীপতির বৌ চমৎকার বাজাতে পারে এসরাজ না কি বলে, একরকম বেহালার মত। শান্তিদের ওবেলা শুনিয়েছিল—

রায়-বৌ বল্লেন—ও! তাই ওবেলা নাইতে যাবার সময় শুনলাম বটে। সে যে ভারী চমৎকার বাজনা গো, আমি বলি বুঝি কোন ফকির বোষ্টম ভিক্ষে করতে এসে বাজাচ্ছে!

এমন সময় শান্তি আসতেই তার মা বল্লেন—ওই জিজ্ঞেস কর না শান্তিকে।

শান্তি বল্লে—উঃ, সে আর তোমায় কি বলব খুড়ীমা, বৌদিদি যা বাজালে অমন কখনো শুনিনি। শুনবে তোমরা? তাহলে এখন বলি বাজাতে—বল্লেই বাজাবে।

শান্তি শ্রীপতিদের বাড়ি চলে যাবার অল্প পরেই শোনা গেল শ্রীপতির বৌয়ের এসরাজ বাজনা। অনেকক্ষণ কারো মুখে কথা রইল না।

চক্কত্তি-গিন্নী বল্লেন, বড় চমৎকার বাজায় তো!

সকলেই স্বীকার করলে শ্রীপতির বৌকে আগে যা ভাবা গিয়েছিল, সে-রকম নয়, বেশ মেয়েটি।

এসরাজ বাজনার মধ্যে দিয়ে পাড়ার সকলের সঙ্গে শ্রীপতির বৌয়ের সহজভাবে আলাপ পরিচয় জমে উঠলো।দুপুরে, সন্ধ্যায় প্রায় সবাই যায় শ্রীপতিদের বাড়ি বাজনা শুনতে।

তারপর গান শুনলো সবাই একদিন। পূর্ণিমার রাত্রে জ্যোৎস্নাভরা ভেতর-বাড়ির রোয়াকে বসে বৌ এসরাজ বাজাচ্ছিল, পাড়ার সব মেয়েই এসে জুটেচে। শ্রীপতি বাড়ি নেই।

কমলা বল্লে—আজ বৌদি একটা গান গাইতেই হবে—তুমি গাইতেও জানো ঠিক—শোনাও আজকে—

বৌটি হেসে বল্লে—কে বলেচে ঠাকুরঝি যে আমি গান গাইতে জানি?

—না, ওসব রাখো—গাও একটা—

সকলেই অনুরোধ করলে। বল্লে—গাও বৌমা, এ পাড়ায় মানুষ নেই, আস্তে আস্তে গাও, কেউ শুনবে না—

শ্রীপতির বৌ একখানা মীরার ভজন গাইলে।

রাণাজী, ম্যয় গিরধর কে ঘর যাঁহু

গিরধর হাম্‌রা সাচো প্রিতম্ দেখত রূপ লুভাঁউ।

গায়িকার চোখেমুখে কি ভক্তিপূর্ণ তন্ময়তার শোভা ফুটে উঠলো গানখানা গাইতে গাইতে—শান্তি একটা গন্ধরাজ আর টগরের মালা গেঁথে এনেছিল বৌদিকেই পরাবে বলে—গান গাইবার সময়ে সে আবার সেটা বৌয়ের গলায় আল্‌গোছে পরিয়ে দিলে—সেই জ্যোৎস্নায় সাদা সুগন্ধি ফুলের মালা গলায় রূপসী বৌয়ের মুখে ভজন শুনতে শুনতে মন্টুর মা'র মনে হলো এই মেয়েটিই সেই মীরাবাই, অনেককাল পরে পৃথিবীতে আবার নেমে এসেছে, আবার সবাইকে ভক্তির গান গাইয়ে শোনাচ্ছে।

মন্টুর মা একটু একটু বাইরের খবর রাখতেন, যাত্রায় একবার মীরাবাই পালা দেখেছিলেন তাঁর বাপের বাড়ির দেশে।

তারপর আর একখানা হিন্দিগান গাইলে বৌ, এঁরা অবিশ্যি কিছু বুঝলেন না। তবে তন্ময় হয়ে শুনলেন বটে।

তারপর একখানা বেহাগ। বাংলা গান এবার। সকলে শুয়ে পড়লো, শান্তির চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগলো।অনেকে দেখলে বৌয়ের চোখ দিয়ে জল পড়ছে গান গাইতে গাইতে—রূপসী গায়িকা একেবারে যেন বাহ্যজ্ঞান ভুলে গিয়েছে গানে তন্ময় হয়ে।

সেদিন থেকেই সকলে শ্রীপতির বৌকে অন্য চোখে দেখতে লাগলো।

ওর সম্বন্ধে ক্রমে উচ্চ ধারণা করতে সকলে বাধ্য হল আরও নানা ঘটনায়। পাড়াগাঁয়ে সকলেই বেশ হুঁশিয়ার, একথা আগেই বলেছি। ধার দিয়ে—সে যদি এক খুঁচি চাল কি দু-পলা তেলও হয়—তার জন্যে দশবার তাগাদা করতে এদের বাধে না। কিন্তু দেখা গেল শ্রীপতির বৌ সম্পূর্ণ দিলদরিয়া মেজাজের মেয়ে। দেবার বেলায় সে কখনও না বলে কাউকে ফেরায় না, যদি জিনিসটা তার কাছে থাকে। একেবারে মুক্তহস্ত সে বিষয়ে—কিন্তু আদায় করতেজানে না, তাগাদা করতে জানে না, মুখে তার রাগ নেই, বিরক্তি নেই, হাসিমুখ ছাড়া তার কেউ কখনো দেখেনি।

শ্রীপতির বৌয়ের আপন-পর জ্ঞান নেই, এটাও সবাই দেখলে। পাশের বাড়িতে চক্কত্তি—গিন্নী বিধবা, একাদশীর দিন দুপুরে তিনি নিজের ঘরে মাদুর পেতে শুয়ে আছেন, শ্রীপতির বৌ একবাটি তেল নিয়ে এসে তাঁর পায়ে মালিশ করতে বসে গেল। যেন ও তাঁর নিজের ছেলের বৌ।

চক্কত্তি-গিন্নী একটু অবাক হলেন প্রথমটা। পাড়াগাঁয়ে এরকম কেউ করে না, নিজের ছেলের বৌয়েই করে না তো অপরের বৌ।

—এসো, এসো, মা আমার এসো।থাক্ থাক, তেল মালিশ আবার কেন মা? তোমায় ওসব করতে হবে না, পাগলী মেয়ে—

এই পাগলী মেয়েটি কিন্তু শুনলে না। সে জোর করেই বসে গেল তেল মালিশ করতে। মাথার চুল এসে অগোছালো ভাবে উড়ে পড়ছে মুখে, সুগৌর মুখে অতিরিক্ত গরমে ও শ্রমে কিছু কিছু ঘাম দেখা দিয়েছে—

চক্কত্তি-গিন্নী এই সুন্দরী বৌটির মুখ থেকে চোখ যেন অন্যদিকে ফেরাতে পারলেন না। বড় স্নেহ হল এই আপন-পর জ্ঞানহারা মেয়েটার ওপর।

ইতিমধ্যে কমলার বিয়ে হলে গেল। শ্বশুরবাড়ি যাবার সময়ে সে শ্রীপতির বৌয়ের গলা জড়িয়ে ধরে কেঁদে বল্লে—বৌদিদি, তোমায় কি করে ছেড়ে থাকবো ভাই? মাকে ছেড়ে যেতে যত কষ্ট না হচ্ছে, তত হচ্ছে তোমায় ছেড়ে যেতে!....এই এক ব্যাপার থেকেই বোঝা যাবে শ্রীপতির বৌ এই অল্প কয়েক মাসের মধ্যে গ্রামের তরুণ মনের ওপর কি রকম প্রভাব বিস্তার করেছিল।

পূজার সময় এসে পড়েচে। আশ্বিনের প্রথম, শরতের নীল আকাশে অনেকদিন পরে সোনালী রোদের মেলা, বনসিমের ফুল ফুটেছে ঝোপে ঝোপে, নদীর চরে কাশ ফুলের শোভা। পাশের গ্রাম সত্রাজিৎপুরে বাঁড়ুয্যে-বাড়ি পুজো হয় প্রতি বৎসর, এবারও শোনা যাচ্ছে মহানবমীর দিন তাদের বাড়ি আর বছরের মত যাত্রা হবে কাঁচরাপাড়ার দলের।

শ্রীপতির বৌ গান-পাগলা মেয়ে, এ কথাটা এতদিনে এ গাঁয়ের সবাই জেনেছে। তার দিন নেই, রাত নেই, গান লেগে আছে, দুপুরে রাত্রে রোজ এস্‌রোজ বাজায়। গান সম্বন্ধে কথা সর্বদা তার মুখে। শান্তির এখনও বিয়ে হয়নি, যদিও সে কমলার বয়সী। সে শ্রীপতির বৌয়ের কাছে আজকাল দিনরাত লেগে থাকে গান শেখবার জন্যে।

একদিন শ্রীপতির বৌ তাকে বল্লে—ভাই শান্তি, এক কাজ করবি, সত্রাজিৎপুরে তো যাত্রা হবে বলে সবাই নেচেছে। আমাদের পাড়ার মেয়েরা তো আর দেখতে পাবে না? তারা কি আর অপর গাঁয়ে যাবে যাত্রা শুনতে? অথচ এরা কখনো কিছু শোনে না—আহা! এদের জন্যে যদি আমরা আমাদের পাড়াতেই থিয়েটার করি?

শান্তি তো অবাক। থিয়েটার! তাদের এই গাঁয়ে? থিয়েটার জিনিসটার নাম শুনেছে বটে সে, কিন্তু কখনো দেখেনি। বল্লে কি করে করবে বৌদি, কি যে তুমি বলো! তুমি একটা পাগল!

শ্রীপতির বৌ হেসে বল্লে—সে সব বন্দোবস্ত আমি করবো এখন। তোকে ভেবে মরতে হবে না—দ্যাখ্ না কি করি।

সপ্তাহখানেক পরে শ্রীপতি যেমন শনিবারের দিন বাড়ি আসে তেমনি এল। সঙ্গে তিনটি বড় মেয়ে ও দুটি ছোট মেয়ে ও চার-পাঁচটি ছেলে। বড় মেয়ে তিনটির ষোল, সতেরো এমনি বয়েস, সকলেই ভারী সুন্দরী, ছোট মেয়ে দুটির মধ্যে যেটির বয়েস বছর তেরো, সেটি ততসুবিধের নয় কিন্তু যেটির বয়স আন্দাজ দশ—তাকে দেখে রক্তমাংসের জীব বলে মনে হয় না, মনে হয় যেন মোমের পুতুল। ছেলেদের বয়েস পনেরোর বেশী নয় কারো।সকলেই সুবেশ, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন।

শান্তি, শান্তির মা এবং চক্কত্তি-গিন্নী তখন সেইখানেই উপস্থিত ছিলেন। শ্রীপতির বৌ ওদের দেখে ছুটে গেল রোয়াক থেকে উঠোনে নেমে। উচ্ছ্বসিত আনন্দের সুরে বল্লে—এই যে রমা, পিন্টু, তারা, এই যে শিবু আয়, আয় সব, কেমন আছিস? ওঃ, কতদিন দেখিনি তোদের—

রমা বলে ষোল-সতেরো বছরের সুন্দরী মেয়েটি ওর গলা জড়িয়ে ধরলে, সকলেই ওকে প্রণাম করে পায়ের ধুলো নিলে।

—দিদি কেমন আছিস ভাই—

—একটু রোগা হয়ে গেছিস দিদি—

—ওঃ, কতদিন যে তোকে দেখিনি—

—দাদাবাবু যখন বল্লেন তোর এখানে আসতে হবে, আমরা তো—

—আহিরীটোলাতে মিউজিক কম্পিটিশন ছিল—নাম দিয়েছিলাম—ছেড়ে চলে এলাম—

মেয়েগুলির মুখ, রং, গড়ন শ্রীপতির বৌয়ের মত। রমা তো একেবারে হুবহু ওর মত দেখতে, কেবল যা কিছু বয়সের তফাত। জানা গেল মেয়ে দুটির মধ্যে রমা ও তার ছোট সতী, এবং ছেলেদের মধ্যে বারো বছরের ফুটফুটে ছেলে শিবু শ্রীপতির বৌয়ের আপন ভাই—বোন, বাকি সবাই কেউ খুড়তুতো, কেউ জ্যাঠতুতো ভাই-বোন।

ক্রমে আরও জানা গেল শ্রীপতির বৌ এদের চিঠি লিখিয়ে আনিয়েছে থিয়েটার করানোরজন্যে।

পাড়ার সবাই এদের রূপ দেখে অবাক। এসব পাড়াগাঁয়ে অমন চেহারার ছেলেমেয়ে কেউ কল্পনাই করতে পারে না। দশ বছরের সেই ছেলেটার নাম পিন্টু, সে শান্তির বড় ন্যাওটা হয়ে গেল। সে আবার একটা সাঁতার দেবার নীল রঙের পোশাক এনেছে, সিক্ত নীল পোশাকে সুগৌর দেহে যখন সে নদীর ঘাটে স্নান করে উঠে দাঁড়ায়—তখন ঘাটসুদ্ধ মেয়েরা—বোসগিন্নী, মন্টুর মা, শান্তির মা, মজুমদার-গিন্নী ওর দিকে হাঁ করে চেয়ে থাকেন। রূপ আছে বটে ছেলেটির! শান্তি দস্তুরমত গর্ব অনুভব করে, যখন পিন্টু অনুযোগ করে বলে—আঃ শান্তিদি, আসুন না উঠে, ভিজে কাপড়ে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবো? আসুন বাড়ি যাই!

পুজো এসে পড়লো। এ গাঁয়ে কোনো উৎসব নেই পুজোয়, গরিবদের গাঁয়ে পুজো কে করবে? দূর থেকে সত্রাজিৎপুরের বাঁড়ুয্যে-বাড়ির ঢাক শুনেই গাঁয়ের মেয়েরা সন্তুষ্ট হয়। ভিন্ গাঁয়ে গিয়ে মেয়েদের পুজো দেখবার রীতি না থাকায় অনেকে দশ-পনেরো কি বিশ বছর দুর্গাপ্রতিমা পর্যন্ত দেখেনি। মেয়েদের জীবনে কোনো উৎসব আমোদ নেই এ গাঁয়ে।

শ্রীপতির বৌ তাই একদিন শান্তিকে বলেছিল—সত্যি কি করে যে তোরা থাকিস্ ঠাকুরঝি—একটু গান নেই, বাজনা নেই, বই পড়া নেই, মানুষ যে কেমন করে থাকে এমন করে!

বোধ হয় সেই জন্যেই এত উৎসাহের সঙ্গে ও লেগেছিল থিয়েটারের ব্যাপারে।

শ্রীপতিদের বাড়ির লম্বা বারান্দার একধারে তক্তাপোশ পেতে দড়ি টাঙিয়ে হলদে শাড়ি ঝুলিয়ে স্টেজ করা হয়েছে।

শ্রীপতির বৌ ভাই-বোনদের নিয়ে সকাল থেকে খাটচে।

শান্তি বল্লে—তুমি এত জানলে কি করে বৌদি?

রমা বল্লে—তুমি জানো না দিদিকে শান্তিদিদি। দিদি অল বেঙ্গল মিউজিক কম্পিটিশনে—

শ্রীপতির বৌ ধমক দিয়ে বোনকে থামিয়ে দিয়ে বল্লে—নে, নে—যা, অনেক কাজ বাকি, এখন তোর অত বক্তৃতা করতে হবে না দাঁড়িয়ে।

রমা না থেমে বল্লে—আর খুব ভাল পার্ট করার জন্যেও সোনার মেডেল পেয়েছে— যতবার পয়লা বোশেখের দিন আমাদের বাড়িতে থিয়েটার হয়, দিদিই তো তার পাণ্ডা— জানো আমাদের কি নাম দিয়েছেন জ্যাঠামশায়—

শ্রীপতির বৌ বল্লে—আবার?

—রমা হেসে থেমে গেল।

মহাষ্টমীর দিন আজ। শুধু মেয়েদের আর ছোট ছোট ছেলেদের নিয়ে থিয়েটার। দেখবে শুধু মেয়েরাই সমস্ত পাড়া কুড়িয়ে সব মেয়ে এসে জুটেছে থিয়েটার দেখতে।

ছোট্ট নাটকটি। শ্রীপতির বৌয়ের জ্যাঠামশায়ের নাকি লেখা। রাজকুমারকে ভালবেসেছিল তাঁরই প্রাসাদের একজন পরিচারিকার মেয়ে। ছেলেবেলায় দু'জনে খেলা করেছে। বড় হয়ে দিগ্বিজয়ে বেরুলেন রাজপুত্র, অন্য দেশের রাজকুমারী ভদ্রাকে বিবাহ করে ফিরলেন। পরিচারিকার মেয়ে অনুরাধা তখন নব-যৌবনা কিশোরী, বিকশিত মল্লিকা-পুষ্পের মত শুভ্র পবিত্র। খুব ভাল নাচতে গাইতে শিখেছিল সে ইতিমধ্যে। রাজধানীর সবাই তাকে চেনে জানে—নৃত্যের অমন রূপ কেউ দিতে পারে না। এদিকে ভদ্রাকে রাজ্যে এনে রাজকুমার এক উৎসব

করলেন। সে সভায় অনুরাধাকে নাচতে গাইতে হল রাজপুত্রের সামনে ভাড়া করা নর্তকী হিসাবে। তার বুক ফেটে যাচ্চে, অথচ সে একটা কথাও বল্লে না, নৃত্যের মধ্যে দিয়ে, সঙ্গীতের মধ্যে দিয়ে জীবনের ব্যর্থ প্রেমের বেদনা সে নিবেদন করলে প্রিয়ের উদ্দেশ্যে।তারপর কাউকে কিছু না বলে দেশ ছেড়ে পরদিন একা কোথায় নিরুদ্দেশ হয়ে গেল।

শ্রীপতির বৌ অনুরাধা;রমা ভদ্রা। ওর অন্য সব ভাই-বোনেরাও অভিনয় করলে। শ্রীপতির বৌ বেশভূষায়, রূপে, গলে দোদুল্যমান জুঁইফুলের মালায় যেন প্রাচীন যুগের রূপকথার রাজকুমারী, রমাও তাই, গানে গানে অনুরাধা তো স্টেজ ভরিয়ে দিলে, আর কি অপূর্ব নৃত্যভঙ্গি! সতী, রমা, পিন্টুও কি চমৎকার অভিনয় করলে, আর কি চমৎকার মানিয়েছে ওদের!

তারপরে বহুকাল পরে পথের ধারে মুমূর্ষু অনুরাধার সঙ্গে রাজপুত্রের দেখা। সে বড় মর্মস্পর্শী করুণ দৃশ্য! অনুরাধার গানের করুণ সুরপুঞ্জে ঘরের বাতাস ভরে গেল। চারিদিকে শুধু শোনা যাচ্ছিল কান্নার শব্দ, শান্তি তো ফুলে ফুলে কেঁদে সারা।

অভিনয় শেষ হল, তখন রাত প্রায় এগারোটা। গ্রামের মেয়েরা কেউ বাড়ি চলে গেল না।তারা শ্রীপতির বৌকে ও রমাকে অভিনয়ের পর আবার দেখতে চায়। শ্রীপতির বৌ ও তার ভাইবোনদের রান্নাঘরে নিয়ে গিয়ে চক্কত্তি—গিন্নী ও শান্তির মা ও মন্টুর মা খেতে বসিয়ে দিলেন আর ওদের চারিধার দিয়ে পাড়ার যত মেয়ে।

ও-পাড়ার রাম গাঙ্গুলির বৌ বল্লেন—বৌমা যে আমাদের এমন তা তো জানিনে! ওমা এমন জীবনে তো কখনো দেখিনি—

মন্টুর মা বল্লেন—আর ভাইবোনগুলিও কি সব হীরের টুকরো! যেমন সব চেহারা তেমনি গান—

শান্তি তো তার বৌদিদির পিছু পিছু ঘুরছে, তার চোখ থেকে অভিনয়ের ঘোর এখনও কাটেনি, সেই জুঁইফুলের মালাটি বৌদির গলা থেকে সে এখনও খুলতে দেয় নি। ওর দিক থেকে অন্যদিকে সে চোখ ফেরাতে পারছে না যেন।

চক্কত্তি-গিন্নী বল্লেন—আর কি গলা আমাদের বৌমার আর রমার! পিন্টু অতটুকু ছেলে, কি চমৎকার করলে!..

শান্তির মা বল্লেন—পিন্টু খাচ্ছে না, দ্যাখ সেজো বৌ। আর একটু দুধ দি, ভাত কটা মেখে নাও বাবা, চেঁচিয়ে তো ক্ষিদে পেয়ে গিয়েছে।....কি চমৎকার মানিয়েছিল পিন্টুকে, না সেজোবৌ?—একে ফুটফুটে সুন্দর ছেলে....

শ্রীপতির বৌ হাজার হোক্ ছেলেমানুষ, সকলের প্রশংসায় সে এমন খুশী হয়ে উঠলো যে খাওয়াই হল না তার। সলজ্জ হেসে বল্লে—জ্যাঠামশায় আমাদের বলেন কিন্নর দল—এখন ওই নামে আমাদের—

রমা হেসে ঘাড় দুলিয়ে বল্লে—নিজে যে বল্লে দিদি, আমি বলতে যাচ্ছিলুম, আমায় তবে ধমক দিলে কেন তখন?

তারা বল্লে—নামটি বেশ—কিন্নর দল, না? আমাদের শ্যামবাজারের পাড়ায় কিন্নর দল বলতে সবাই চেনে।

রমা বল্লে কৃত্রিম গর্বের সঙ্গে—প্রায় এক ডাকে চেনে—হুঁ—হুঁ—

তারপর এই রূপবান বালক-বালিকার দল সকলে একযোগে হঠাৎ খিল্‌খিল্ করে মিষ্টি হাসি হেসে উঠলো।

সতী হাসতে হাসতে বল্লে—বেশ নামটি—কিন্নর দল, না?

এমন একদল সুশ্রী চেহারার ছেলেমেয়ে, তার ওপর তাদের এমন অভিনয় করার ক্ষমতা, এমন গানের গলা, এমনি হাসিখুশী মিষ্টি স্বভাব, সকলেরই মনোহরণ করবে তার আশ্চর্য কি?

মন্টুর মা ভাবলেন, কিন্নর দলই বটে!....

ওদের খেতে খেতে, হাসি গল্প করতে করতে মহাষ্টমীর নিশি প্রায় ভোর হয়ে এল।

শ্রীপতির বৌ বল্লে, আসুন, বাকি রাতটুকু আর সব বাড়ি যাবেন কেন? গল্প করে কাটানো যাক!

শ্রীপতি বাড়ি নেই, সে সত্রাজিৎপুরের বাঁড়ুয্যে-বাড়ির নিমন্ত্রণে গিয়েছে, আজ রাত্রের যাত্রা দেখে সকালে ফিরবে। সেইজন্যে সকলে বল্লে, তা ভাল, কিন্তু বৌমা তোমাকে গান গাইতে হবে।

শান্তি বল্লে—বৌদি, অনুরাধার সেই গানটা গাও আর একবার। আহা, চোখে জল রাখা যায় না শুনলে।

শ্রীপতির বৌ গাইলে, রমা এসরাজ বাজালে। তারপর রমা ও তারা একসঙ্গে গাইলে।

একটিমাত্র তেড়ো-পাখি বাঁশগাছের মগ্‌ড়ালে কোথায় ডাক্ আরম্ভ করেছে। রাত ফরসা হল।

সে মহাষ্টমীর রাত্রি থেকে গ্রামের সবাই জানলে শ্রীপতির বৌ কি ধরনের মেয়ে।

কেবল তারা জানলে না যে শ্রীপতির বৌ প্রতিভাশালিনী গায়িকা, সত্যিকার আর্টিস্ট। সে ভালবেসে শ্রীপতিকে বিয়ে করে এই পাড়াগাঁয়ের বনবাস মাথায় করে নিয়ে, নিজের উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছেড়েচে—যশের আশা, অর্থের আশা, আর্টের চর্চা পর্যন্ত ত্যাগ করেছে। তবু গানের ঝোঁক ওকে ছাড়ে না—ভূতে পাওয়ার মত পেয়ে বসে—দিনরাত তাই ওর মুখে গান লেগেই আছে, তাই আজ মহাষ্টমীর দিন সেই নেশার টানেই এই অভিনয়ের আয়োজন করেচে।

শান্তি কিছুতেই ছাড়তে চায় না ওকে। বলে, তুমি কোথাও যেও না বৌদিদি, আমি মরে যাবো, এখানে তিষ্ঠুতে পারবো না।শান্তি আজকাল শ্রীপতির বৌয়ের কাছে গান শেখে, গলামন্দ নয় এবং এদিকে খানিকটা গুণ থাকায় সে এরই মধ্যে বেশ শিখে ফেলেছে। কিছু কিছু বাজাতেও শিখেচে। গান-বাজনায় আজকাল তার ভারী উৎসাহ। শ্রীপতির বৌ তো গান—বাজনা যদি পেয়েছে, আর বড় একটা কিছু চায় না, শান্তির মত সঙ্গীর শিক্ষা নিয়েই সে সব সময় মহাব্যস্ত।

অগ্রহায়ণ মাসের দিকে বৌয়ের বাড়ি থেকে চিঠি এল রমা কি হয়ে হঠাৎ মারা গিয়েছে। শ্রীপতি কলকাতা থেকে সংবাদটা নিয়ে এল। শ্রীপতির বৌ খুব কান্নাকাটি করলে। পাড়াসুদ্ধ সবাই চোখের জল ফেললে ওকে সান্ত্বনা দিতে এসে।

শান্তি সব সময় বৌদির কাছে কাছে থাকে আজকাল। তাকে একদিন শ্রীপতির বৌ বল্লে—জানিস্ শান্তি, আমাদের কিন্নরের দল ভাঙতে শুরু করেছে, রমাকে দিয়ে আরম্ভ হয়েছে, আমার মন যেন বলছে....

শান্তির বুকের ভেতরটা ছ্যাঁৎ করে উঠলো, ধমক দিয়ে বল্লে, থাক ওসব, কি যে বল বৌদি!

কিন্তু শ্রীপতির বৌয়ের কথাই খাটলো।

সে ঠিকই বলেছিল, শান্তি ঠাকুরঝি, কিন্নরের দলে ভাঙন ধরেছে।

রমার পরে ফাল্গুন মাসের দিকে গেল পিন্টু বসন্ত রোগে। তার আগেই শ্রীপতির বৌ মাঘ মাসে বাপের বাড়ি গিয়েছিল, শ্রাবণ মাসের প্রথমে প্রসব করতে গিয়ে সেও গেল।

এ সংবাদ গ্রামে যখন এল, শান্তি তখন সেখানে ছিল না, সেই বোশেখ মাসে তার বিবাহ হওয়াতে সে তখন ছিল মেটিরি বাণপুর, ওর শ্বশুরবাড়িতে। গ্রামের অন্য সবাই শুনলে, অনাত্মীয়ের মৃত্যুতে খাঁটি অকৃত্রিম শোক এরকম এর আগে কখনো এ গাঁয়ে করতে দেখা যায় নি। রায়-গিন্নী, চক্কত্তি-গিন্নী, শান্তির মা, মন্টুর মা কেঁদে ভাসিয়ে দিলেন। ঐ মেয়েটি কোথা থেকে দু'দিনের জন্যে এসে তার গানের সুরের প্রভাবে সকলের অকরুণ, কুটিল ভাবে পরিবর্তন এনে দিয়েছিল, সে পরিবর্তন যে কতখানি, ওই সময়ে গাঁয়ের মেয়েদের দেখলে বোঝা যেত। ওদের চক্কত্তি-বাড়ির দুপুর বেলার আড্ডায়, স্নানের ঘাটে শ্রীপতির বৌয়ের কথা ছাড়া অন্য কথা ছিল না।

চক্কত্তি-গিন্নী শোক পেয়েছিলেন সকলের চেয়ে বেশী। শ্রীপতির বৌয়ের কথা উঠলেই তিনি চোখের জল সামলাতে পারতেন না। বলতেন, দু'দিনের জন্যে এসে মা আমার কি মায়াই দেখিয়ে গেল! আমার পেটের মেয়ে অমন ক্খনো করেনি...আহা, আমার পোড়া কপাল, সে কখনো এ কপালে টঁকে!

মন্টুর মা বলতেন, সে কি আর মানুষ! দেবীঅংশে ওসব মেয়ে জন্মায়। নিজের মুখেই বলতো হেসে হেসে, "আমরা কিন্নরের দল খুড়ীমা'—শাপভ্রষ্ট কিন্নরই তো ছিল।....যেমন রূপ, তেমনি স্বভাব, তেমনি গান...ওকি আর মানুষ, মা!

কথা বলতে বলতে মন্টুর মার চোখ দিয়ে ঝর্ ঝর্ করে জল পড়তো।

এসবের মধ্যে কেবল কথা বলতো না শান্তি। তার বিবাহিত জীবন খুব সুখের হয় নি, ভেবেছিল বাপের বাড়ি এসে বৌদিদির সঙ্গে অনেকখানি জ্বালা জুড়োবে। পুজোর পরে কার্তিক মাসের প্রথমে বাপের বাড়ি এসে সে সব শুনেছিল। বৌদিদি যে তার জীবন থেকে কতখানি হরণ করে নিয়ে গিয়েছে, তা এরা কেউ জানে না। মুখে সে-সব পাঁচজনের সামনে ভ্যাজ্ ভ্যাজ্ করে বলে লাভ কি? কি বুঝবে লোকে?

বছর দুই পরে একদিনের কথা। গাঁয়ের মধ্যে শ্রীপতির বৌয়ের কথা অনেকটা চাপা পড়েগিয়েছে। শ্রীপতিও অনেকদিন পরে আবার গ্রামের বাড়িতে যাওয়া-আসা করছে শনিবারে কিংবা ছুটিছাটাতে।

শ্রীপতিদের বাড়ি থেকে শান্তিদের বাড়ি বেশী দূর নয়, দু'খানা বাড়ির পরেই। শান্তি তখন এখানেই ছিল। অনেক রাত্রে সে শুনলে শ্রীপতিদাদাদের বাড়িতে কে গান গাইচে! ঘুমের মধ্যে গানের সুর কানে যেতেই সে ধড়মড় করে বিছানার ওপর উঠে বসলো—

বিরহিণী মীরা জাগে তব অনুরাগে, গিরিধর নাগর—

এ কার গলা? ওর গা শিউরে উঠলো। ঘুমের ঘোর এক মুহূর্তে ছুটে গেল। কখনো সে ভুলবে এ জীবনে এ গান, এ গলা? সেই প্রথম পরিচয়ের দিনে ওদের রোয়াকে জ্যোৎস্নারাত্রে বসে এই গানখানাই বৌদিদি প্রথম গেয়েছিল। সেই অপূর্ব করুণ সুর, গানের সুরের প্রতি মোচড়ে যেন একটি বিষণ্ণ আকাঙ্ক্ষার প্রাণঢালা আত্মনিবেদন। এ কি আর কারো গলার—ওর কুমারী জীবনের আনন্দভরা দিনগুলির কত অবসর প্রহর যে এ কণ্ঠের সুরে মধুময়!

ও পাগলের মত ছুটে ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ালো।

রাত অনেক। কৃষ্ণাতৃতীয়ার চাঁদ মাথার ওপর পৌঁছেচে। ফুটফুটে শরতের জ্যোৎস্নায় বাঁশবনের তলা পর্যন্ত আলো হয়ে উঠেছে।

ঠিক যেন তিন বছর আগেকার সেই মহাষ্টমীর রাত্রির মত।

শান্তির মা ইতিমধ্যে জেগে উঠে বল্লেন, ও কে গান করছে রে শান্তি ? তারপর তিনিও তাড়াতাড়ি বাইরে এলেন।শ্রীপতিদের বাড়ি তো কেউ থাকে না, গান গাইবে কে? ওদিকে মন্টুর মা মণি, বাদল সবাই জেগেছে দেখা গেল।

প্রথমটা এরা সবাই ভয়ে বিস্ময়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল। পরে ব্যাপারটা বোঝা গেল। শ্রীপতি কখন রাতের ট্রেনে বাড়ি এসেছিল, কেউ লক্ষ্য করেনি।সে কলের গান বাজাচ্ছে। ওদের সাড়া পেয়ে সে বাইরে এসে বল্লে—আমার এক বন্ধুর কাছ থেকে আজ চেয়ে আনলুম ওর গানখানা। মরবার ক'মাস আগে রেকর্ডে গেয়েছিল।

সবাই খানিকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। শান্তি প্রথমে সে নীরবতা ভঙ্গ করে আস্তে আস্তে বল্লে ছিরুদা, রেকর্ডখানা আর একবার দেবে!

পরক্ষণেই একটি অতি সুপরিচিত, পরমপ্রিয়, সুললিত কণ্ঠের দরদ-ভরা সুরপুঞ্জে পাড়ার আকাশ-বাতাস, স্তব্ধ জ্যোৎস্না-রাত্রিটা ছেয়ে গেল। মানুষের মনের কি ভুলই যে হয়! অল্পক্ষণের জন্যে শান্তির মনে হল তার

কুমারী জীবনের সুখের দিনগুলি আবার ফিরে এসেছে, যেন বৌদিদি মরেনি, কিন্নরের দল ভেঙে যায়নি, সব বজায় আছে। এই তো সামনে আসছে পুজো, আবার মহাষ্টমীতে তাদের থিয়েটার হবে, বৌদিদি গান গাইবে। গান থামিয়ে ওর দিকে চেয়ে হাসি হাসি মুখে বলবে—কেমন শান্তি ঠাকুরঝি, কেমন লাগলো।